BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03110014

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 11| November 2025| e-ISSN: 2584-1890

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক চেতনায় 'আনন্দমঠ'

Dipak Kumar Ghosh

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi
Email: dipakghoshrp@gmail.com

Abstract:

এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটির প্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা, তাঁর পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ এবং দেশমাতৃকার বিবিধ রূপের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের পরাধীনতার গ্লানি এবং ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসটি একটি কালজয়ী জাতীয়তাবাদী রচনা হিসেবে আবির্ভূত হয়। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এবং 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'সন্তান দল' নামক একদল উৎসর্গীকৃত রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর কথা বলেছেন, যাঁদের লক্ষ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মাতৃভূমির মুক্তি। প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে কীভাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'অনুশীলন তত্ত্ব'-এর মাধ্যমে ভক্তি, ত্যাগ এবং শক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বিশেষত, 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি জন্মভূমিকে যেভাবে সর্বকল্যাণময়ী জননী রূপে কল্পনা করেছেন, তা পরবর্তীকালে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে 'জাতীয় মন্ত্রে' পরিণত হয়। এছাড়াও, নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ইংরেজ শাসনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাথে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, জাতিভেদহীন দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী শক্তির অবদানের কথা উল্লেখ করে 'আনন্দমঠ'-কে ভারতীয় বিপ্লববাদের এক অনন্য প্রেরণা উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

Key Words: *বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, জাতীয়তাবাদ, বন্দেমাতরম, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, দেশমাতৃকা।*

Introduction:

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের স্বরূপ এবং পরাধীনতার মর্মবেদনাকে তুলে ধরে তৎকালীন ভারতীয় সাহিত্য জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম সম্পর্কে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ -তাঁদের বিভিন্ন রচনায় এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রকাশ পেতে শুরু করে। এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী রচনা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২)। এই উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট ছিল ১১৭৬ বঙ্গাব্দে 'বাংলার মন্বন্তর' এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'। তৎকালীন সময়ে মানুষের হাহাকার ও অন্নাভাবের অবস্থাকে কেন্দ্র করে তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছেন। সন্ন্যাসের নতুন আদর্শ প্রচার করে তিনি মাতৃমুক্তি যজ্ঞে নিবেদিতপ্রাণ একদল রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর কথা বলেন। যাঁদের মূল উদ্দেশ্য হবে মানবমুক্তি, দেশমাতৃকার মুক্তি এবং মানব কল্যাণ। যাঁদের এক হাতে থাকবে মায়ের পূজার ফুল এবং অন্য হাতে থাকবে অস্ত্র। অর্থাৎ সন্ন্যাসীরা একদিকে যেমন মাতৃমুক্তির মাধ্যমে দেশবাসীর কল্যান করবেন অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের পতন করবেন।

Discussion:

আনন্দমঠ উপন্যাসের মূল ঘটনা আবর্তিত হয় মহেন্দ্র সিং এবং কল্যাণী দেবী নামক এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের দম্পতিকে কেন্দ্র করে, যারা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে প্রস্থান করছিল। কিন্তু পথে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র স্বামী সত্যানন্দ কল্যাণী ও তার শিশুকন্যাকে গভীর অরণ্য থেকে উদ্ধার করে মহেন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেন এবং মহেন্দ্র স্বামী সত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্তান দলের সদস্য হন। স্বামী সত্যানন্দ তৎকালীন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে সন্তানদল গড়ে তোলেন। গভীর অরণ্যে স্বামী সত্যানন্দ এবং তাঁর শিষ্য যথা- ভবানন্দ, জীবানন্দ প্রমুখেরা আশ্রম তৈরি করে সংগ্রামের জন্য অনুশীলন শুরু করেন। এই আশ্রমের নাম ছিল 'আনন্দমঠ'। তাঁরা আশ্রমে দেশমাতৃকার স্বরূপ হিসেবে মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আরাধনা করতেন। তাঁরা বঙ্গজননীর পরাধীনতা দূরীকরণে ব্রতী হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিপ্লবী এবং চরমপন্থী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' যে 'অনুশীলন তত্ত্ব'র উল্লেখ রয়েছে তার থেকেই বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি 'অনুশীলন সমিতি' নামটি গ্রহণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, দেশের স্বাধীনতা আসবে ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত একনিষ্ঠ সন্ন্যাসী সত্যানন্দের মত প্রকৃত নেতার অধীনে এবং সন্তানদলের আত্মবল, দেশপ্রেম ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে, আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে নয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখানো পথেই ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী ওঅগ্নিযুগের সূচনা হয়, যাঁরা চরমপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন।

'আনন্দমঠে'র আখ্যানভাগ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের দু'টি স্মরণীয় ঘটনা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং মন্বন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। বাংলায় মুসলমান শাসনের অবসান ঘটেছে অথচ ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। পলাশীর যুদ্ধের পরের সেই ঘনান্ধকারময় দুর্দিনে 'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা' বঙ্গমাতা সন্তানের প্রতি বিরূপ হলেন। ১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয়নি, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হল। লোকের কষ্ট হল, কিন্তু রাজ্য রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় আদায় করল। রাজস্ব দিয়ে দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করল। ১১৭৬ সালে সে এক সন্ধ্যা আহারও জুটল না, বাংলায় মন্বন্তর উপস্থিত হল। একে দেবতার অভিশাপ, তার ওপর রেজা খাঁর জুলুম, বাংলায় কান্নার কোলাহল শুরু হয়ে গেল। সেদিনের বাংলার দুর্দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-

> "তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ্ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"[১]

অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে তৎকালীন বাংলার মসীলিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের স্বরূপ প্রকট হয়েছে। কিন্তু এখানে একটি ঐতিহাসিক ভুলের উল্লেখ প্রয়োজন। মীরজাফর 'মুনষ্যকুলকলঙ্ক', এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না; কিন্তু ছিয়াত্তরের সময়ের অরাজকতার সঙ্গে তার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। কারণ তার মৃত্যু হয় মন্বন্তরের পাঁচ বছর পূর্বে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এবং মন্বন্তরের পাঁচ বছর পূর্বে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এবং মন্বন্তরের সময় মুর্শিদাবাদের মসনদে আসীন ছিল তার পুত্র সৈয়েফুদ্দৌলা। সৈয়েফুদ্দৌলার মৃত্যু হয় মন্বন্তরের বছরেই (১০ মার্চ, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তার মৃত্যুর পর মসনদে আরোহণ করে তার নাবালক ভ্রাতা বারেকুদ্দৌলা। মীরজাফরের কুশাসনের সঙ্গে বাংলার পাঠক সুপরিচিত বলেই বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত মন্বন্তরের সঙ্গে অখ্যাত পুত্রের পরিবর্তে কুখ্যাত পিতার নাম জড়িত করে থাকবেন এবং এতে আর যাই হোক, মীরজাফরের খ্যাতির বোঝা অধিকতর ভারাক্রান্ত হয়নি।

একদিকে রাজশক্তির অক্ষমতা ও অব্যবস্থা, অন্যদিকে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ -এই উভয় কারণে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল তাই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে এই বিশৃঙ্খলতার নিখুঁত চিত্র দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত, শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ দস্যুদলের পরিকল্পনা যতই বীভৎস হোক, তা দেশের তৎকালীন অবস্থার উপর তীব্র আলোকপাত করে। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক -বাংলার এই দ্বিবিধ দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য। ক্যাপ্টেন টমাসের বৃহত্তর সত্য রক্ষিত হয়েছে। কারণ চরিত্রের যে শক্তিবলে ইংরেজ জাতি সুদূর পশ্চিম থেকে প্রাচীতে তার আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে, এই চিত্রে সেই বিশিষ্ট চরিত্রবলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের চরিত্র যে বর্ণে চিত্রিত হয়েছে তা ইতিহাসসম্মত নয়। বিদ্রোহীরা কর্মঠ,

সাহসী ও সুনিপুণ ছিল, এটা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু তারা অবাঙ্গালী এবং তারা শিক্ষিত ছিল না। তাছাড়া সত্যানন্দ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যে দেশপ্রাণতার উন্মাদনা রয়েছে, তাঁরা হিন্দুরাজ্য পুনঃসংস্থাপনের যে স্বপ্ন দেখেছেন তা সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত। এই প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার লিখেছেন-

> "সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুটেরা ছিল, মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গিয়া দেখিতে গেলে 'আনন্দমঠে বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটা খন্ডযুদ্ধ বাধে) অনেকাংশে অসত্য।"[২]

প্রকৃতপক্ষে 'আনন্দমঠ' এবং এর পরবর্তী রচনা 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' রাজনৈতিক চেতনা জড়িত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নয়, এবং শেষোক্ত উপন্যাসটির 'বিজ্ঞাপনে' তিনি এটা স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন। এই তিনখানি উপন্যাসের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক কাঠামোকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত অনুশীলনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশিষ্ট মতবাদ প্রচারের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করেছেন এবং আচার্য্য যদুনাথের ভাষায় এটাই 'আনন্দমঠ, 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'র 'অমৃত রস'।

'আনন্দমঠের একটি বিশিষ্ট সুর দেশপ্রীতি এবং এর অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত। এই সঙ্গীত 'আনন্দমঠ'র অনেক আগের রচনা এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় 'আনন্দমঠে'র যে সকল বিভিন্ন মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাঁদের পরিকল্পনার সঙ্গে এতে যে মাতৃমূর্তির পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। 'আনন্দমঠে' প্রতিষ্ঠিত অতীতের মাতৃমূর্তি 'সর্ব্বাভরণভূষিতা' 'জগদ্ধাত্রীরূপিণী'। এই রূপে সোনার বাংলাকে একদিন তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী করেছিলেন। আজ মায়ের সে ঐশ্বর্য্য নেই, তাঁর অধরে সে দিব্য হাসি নেই। দেশব্যাপী মন্বন্তরের মধ্যে বর্তমানের মাতৃমূর্তি 'অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী' 'কালীরূপিনী, হৃতসর্ব্বস্বা', এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান-তাই মা 'কঙ্কালমালিনী'। আর ভবিষ্যতের মাতৃমূর্তি-

> "সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা দিগভূজা- নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী- বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী- দক্ষিণে লক্ষ্মী ভীগ্যরূপিণী- বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী- সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ;"[৩]

-শারদীয়া সপ্তমী তিথিতে এই রূপেই দেবী ক্ষণিকের জন্য কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং ইহাকেই কমলাকান্ত মুহূর্তে 'জননী জন্মভূমি' বলে চিনে নিয়েছিলেন।

অতীতের বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের এই ত্রিবিধ মূর্তি ছাড়াও আনন্দমঠে আর এক মাতৃমূর্তি রয়েছে। এই মূর্তিতে তিনি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রাণে নব প্রেরণার সঞ্চার করেন। মনে হয় মায়ের এই মূর্তি সম্পূর্ণরূপে সত্যানন্দ ঠাকুরের নিজস্ব পরিকল্পনা। ইনি-

> "বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি- লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা।"[৪]

মাতৃভক্ত সন্তান ইচ্ছানুরূপ মায়ের মূর্ত্তি কল্পনা করে নেবেন -হয়ত এই উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এই বিশিষ্ট মাতৃমূর্তির এর থেকে বেশি রূপবর্ণনা করেননি। কিন্তু জগদ্ধাত্রী, কালী ও দশভূজার ন্যায় ইনিও 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের মাতৃমূর্ত্তি থেকে স্বতন্ত্র্য রূপে পরিকল্পিত। কারণ এর বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে সরস্বতী, অর্থাৎ ইনি এই উভয় দেবী থেকে স্বতন্ত্র্য; পক্ষান্তরে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে মায়ের যে মূর্তি রূপায়িত হয়েছে তা সকল দেবীর সমন্বয়ে গঠিত রূপ-রস-গন্ধময়ী সজীব মাতৃমূর্তি। ভক্ত সন্তান মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেন; বাংলার জলে, বাংলার ফলে, বাংলার স্নিগ্ধ বায়ুতে, বাংলার শ্যামল শস্যক্ষেত্রে তিনি দেদীপ্যমানা। পূর্ণিমা রজনীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে তিনি হাস্যময়ী, কাননের কুসুমশোভায় তিনি শোভাময়ী, বনের মর্মরে, পাখীর কলতানে তাঁর কণ্ঠের আবাস পাওয়া যায়। মায়ের এই এক রূপ; এই রূপে তিনি সুখদা, বরদা সর্ব্বকল্যাণময়ী।

কিন্তু সাধক যখন দেবতার ধ্যানে তন্ময় হয়ে পড়েন, তখন উপাসক ও উপাস্য দেবতার মধ্যে পার্থক্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ভক্ত তখন নিজের মধ্যে দেবতাকে উপলব্ধি করেন। মায়ের অপর রূপে তাই তিনি সন্তান থেকে অভিন্না। সপ্তকোটি

কণ্ঠের কলনিনাদে তিনি ভয়ঙ্করী, দ্বি-সপ্তকোটি হস্তধৃত শাণিত অস্ত্রে তিনি শক্তিময়ী। এই রূপে তিনি শত্রুমর্দ্দিনী, সর্ব্বাপদে সন্তানের ত্রাণকর্ত্রী। মাতৃভক্ত সন্তানের তিনিই সকল প্রেরণার উৎস, তিনিই তাঁর ধ্যানের দেবতা, তাঁর একমাত্র দেবতাঙ্গ তিনি বিদ্যা, তিনি ধর্ম, তিনি হৃদি, তিনি মর্ম্ম, তিনিই শরীরে প্রাণরূপিণী। বাহুতে তিনিই শক্তির সঞ্চার করেন, হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য তাঁহাতেই নিবেদিত হয়। মন্দিরে মন্দিরে সকল বিগ্রহের মধ্যে মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের অপরূপ রূপ দেখিতে পান। তিনিই দশপ্রহরণধারিণী দূর্গা, তিনিই কমলদলবিহারিণী কমলা, তিনিই বিদ্যাদায়িনী বাণী। সন্তানের জীবনের সাধনা মাতৃপূজা আর এই মাতৃপূজার মন্ত্র 'বন্দেমাতরম'।

"এই গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎ-বাক্য আছে।"[৫] একদিন আসবে- সেদিন হয়ত তিনি বেঁচে থাকবেন না- যেদিন "এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।"[৬] মহাপুরুষের বাণী ব্যর্থ হয়নি। অগ্নিযুগের বিপ্লবী বাংলা এই সঙ্গীত থেকে নূতন উদ্দীপনা লাভ করেছে। সেদিন এই সঙ্গীত একদিকের যেমন অত্যাচারী রাজশক্তিকে সন্ত্রস্ত করেছে, অন্যদিকে তেমনই বাংলার বিপ্লবী সন্তানকে মৃত্যুর সম্মুখে মরণজয়ী করেছে এবং আজকের স্বাধীন ভারতে 'বন্দেমাতরম' আমাদের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশমাতৃকার বন্দনা হিসেবে গানটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি এই গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সংযোজন করেন। যদুভট্ট-এর সুরে গানটি পরবর্তীতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের কাছে জাতীয় মন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদাম ভিকাজি কামা স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় পতাকার যে রূপ প্রদান করেছিলেন, সেখানেও দেবনাগরী হরফে 'বন্দেমাতরম্' শব্দটি লেখা ছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ 'Mother I bow to thee' শিরোনামে 'বন্দেমাতরমে'র ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান সম্প্রদায় বিপ্লববাদী। ক্ষীণশক্তি মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর তাঁরা নূতন করে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন এবং এই স্বপ্নকে সফল করার উদ্দেশ্যে তাঁরা ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হয়েছেন। অথচ সত্যানন্দ নিজেকে ও তাঁর অনুচরবর্গকে বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের অনুসৃত অভিনব বৈষ্ণবধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহেন্দ্র সিংহের প্রশ্নের উত্তরে সত্যানন্দ বলেছেন-

> "প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। ...তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। ...চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়- কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন- তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়- সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব- কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।"[৭]

-সত্যানন্দ ঠাকুরের এই উক্তি তাঁর আদর্শের অসম্পূর্ণতার পরিচয় দেয়। তিন শক্তির সাধনা করেছেন, কিন্তু শক্তি ও প্রেমের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন নেই। এমন কি, তিনি যে এ সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করেছেন উপন্যাসে সেরূপ আভাস নেই।

সন্তান সম্প্রদায়ের ত্যাগ অনন্যসাধারণ, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ও অপরিসর। তাঁদের দেশপ্রীতির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্কিমের মতবাদ ও আদর্শ এই বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের মতবাদ ও আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানবমনের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় দেশপ্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মের কষ্টিপাথরের যাচাই করে নিয়েছেন। তিনি বিপ্লবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি, কিন্তু বিপ্লববাদীদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, তাঁরা অনেক সময় এটাকে এতখানি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়ের সৎ অসৎ বিচার করেন না। এর ফলে অনেক সময় তাঁরা 'আত্মঘাতী' হয়ে থাকেন। মহাপুরুষ চিকিৎসক সন্তান সম্প্রদায়ের এই দুষ্টক্ষতের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে সত্যানন্দকে বলেছেন-

> "তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না, অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না।"[৮]

বিপ্লবীরা স্বাধীনতাকে স্বাধীনতার জন্যই কাম্য বিবেচনা করেন। কিন্তু স্বাধীনতা যতবড় সম্পদ হোক, বঙ্কিমের দৃষ্টিতে এটা মুখ্য বলে গণ্য হয়নি। স্বাধীনতা স্বাধীনতার জন্যই কাম্য নয়, এটা ধর্মের অনুকূল বলে কাম্য। প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীনতা বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝে থাকি, বঙ্কিমচন্দ্র তা থেকে স্বাধীনতার স্বতন্ত্র সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

> "সমাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানী। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র।"[৯]

-স্বাধীনতার এই ব্যাখা কতখানি গ্রহণযোগ্য সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠতে পারে এবং স্বদেশীয় রাজা অনেক সময় স্বাধীনতার শত্রু হলেও বিদেশীয় রাজা যে স্বাধীনতার মিত্র নয়, সাম্রাজ্যবাদীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন তাই আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়।

সন্তান সম্প্রদায়ের আদর্শ দেশপ্রীতি; বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতিকে অতি উচ্চ স্থান দিলেও তাঁর আদর্শ মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম, ভক্তিতে যার পূর্ণ অভিব্যক্তি। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ব্যর্থতা উপলক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' অনুশীলন তত্ত্বের সারকথা এই ভক্তির বাণী প্রচার করেছেন এবং উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা'র পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদেরকে সত্যানন্দের সাধনার বিচার করতে হবে। এই 'উপক্রমণিকা' একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এটা একদিকে যেমন আখ্যায়িকার উপযোগী গাম্ভীর্যপূর্ণ অতীন্দ্রিয় আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে তেমনই প্রারম্ভেই উপন্যাসের মূল যে ভক্তিতত্ত্ব, অর্থাৎ সর্ব কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণের প্রয়োজনীয়তার আভাস দিয়েছে। আখ্যায়িকার সূত্র অনুসরণ করতে করতে পাঠক যখন এই মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত-প্রায় হয়েছেন, তখন মহাপুরুষ চিকিৎসকের কৃপায় জীবনান্দ পুনর্জীবন লাভ করলে শান্তির নির্দেশমত তাঁর অপূর্ব প্রায়শ্চিত্তের সঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে এই সত্যের প্রতি পুনরায় তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এবং এর অব্যবহিত পরেই সত্যানন্দের নিকট যখন প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে বিসর্জনের আহ্বান এল, তখন 'উপক্রমণিকা'র সঙ্গে আখ্যায়িকার যোগসূত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলেন।

বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা বঙ্কিমের জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু ভাল হোক, মন্দ হোক, ভারতে ইংরেজ শাসন ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রকেও এই সত্য স্বীকার করতে হয়েছে। এই কারণেই তাঁকে জয়ের মুহূর্তে সন্তান সম্প্রদায়ের কর্মমুখর জীবনের উপর যবনিকা টানতে হয়েছে। কিন্তু এটা যত বড় ট্র্যাজেডি হোক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতে ইংরেজ শাসনের পশ্চাতে বিধাতার মঙ্গলবিধান লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে সত্যানন্দের প্রতি মহাপুরুষ চিকিৎসকের সান্ত্বনাবাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন-

> "প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান সেই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্কুল কি, তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে-কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই- শিখায় এমন লোক নাই; ...ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।"[১০]

চরিত্রবিশেষকে যত প্রাধান্য দেওয়া হোক না কেন, তাঁর মতবাদের মধ্যে চরিত্রস্রষ্টার মতবাদ খুঁজতে হলে- বিশেষ করে যেখানে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক জড়িত রয়েছে, সেরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে চরিত্রস্রষ্টা যদি কোনো প্রবন্ধে তাঁর মতবাদ প্রচার করে থাকেন তাহলে তার সঙ্গে এই মতবাদের সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তার বিচার প্রয়োজন। এটি একটি সুনির্দিষ্ট নীতি। সৌভাগ্যবশত 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। নিম্নে এর প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা হল-

> "গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?
>
> শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোমতের প্রথম চারি- Mathematics, Astronomy Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে ?

শিষ্য। বহির্ব্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্ব্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোমতের শেষ দুই Biology, Sociology, এ আনও পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞা করিবে।"[১১]

-এর পরিপ্রেক্ষিতে 'আনন্দমঠে' মহাপুরুষের উল্লিখিত উক্তি বঙ্কিমের মতবাদের প্রতিধ্বনি, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। ইংরেজ শাসনের কুফল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কাহারও অপেক্ষা কম সচেতন ছিলেন না এবং কর্মজীবনে তিনি কখনও উদ্ধত রাজপুরুষের নিকট নতি স্বীকার করেননি। কিন্তু বঙ্কিমের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের শুভ স্পর্শ অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন-

"সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু যে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্তব্য।"[১২]

মহাপুরুষ চিকিৎসকের তথা বঙ্কিমের দৃষ্টিতে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়নি। এই বিদ্রোহের ফলে এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় অরাজকতার অবসান হয়েছে এবং ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য বহির্বিজ্ঞান চর্চার সমন্বয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এখানেই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের সার্থকতা। যদিও তিনি ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে বুঝেছিলেন যে জাতীয়তাবোধ জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করে, কিন্তু তিনি কখনোই ইউরোপীয়দের অনুকরণে জাতীয়তাবোধকে সমর্থন করেননি। কারণ তিনি মনে করতেন যে ইউরোপে দেশপ্রেম থাকলেও বিশ্বমানবপ্রেম নেই। যে কারণে তারা নিজ দেশের উন্নতি সাধনের স্বার্থে সমগ্র মানবজাতির ক্ষয়ক্ষতি করেছে ও যুদ্ধ বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি ইউরোপীয়দের দেশপ্রেম সম্পর্কে লিখেছেন-

"তাঁরা আপনার জাতিকে ভালোবাসেন, অন্য জাতিকে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব।"[১৩]

আশাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র এটাও বিশ্বাস করতেন যে-

"যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।"[১৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে জন্মভূমি নিছক জনসমষ্টি বা ভৌগোলিক অঞ্চল নয়। তিনি জন্মভূমিকে মাতৃরূপে এবং দেবীরূপে কল্পনা করেছেন। যে কারণে তিনি ভবানন্দের জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন-

"আমরা অন্য মা মানি না- জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরনশীতলা, শস্যশ্যামলা,--।"[১৫]

বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের মাধ্যমে দেশবাসীকে বুঝিয়েছেন যে, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ সকলের সমবেত প্রচেষ্টা ও জাগরনের মধ্যদিয়েই দেশমাতৃকার মুক্তির সম্ভব। তাই সত্যানন্দ সন্তানদলকে দীক্ষিত করতে গিয়ে বলেছেন-

"সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই।"[১৬]

Conclusion:

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের 'গীতা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারাই প্রদর্শন করেননি, একইসঙ্গে তিনি কল্যাণী, শান্তি, গৌরীদেবী, নিমাই প্রমুখ নারী চরিত্রগুলির

মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শান্তি (নবীনানন্দ) চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন যে সঠিক শাস্ত্র ও অস্ত্র শিক্ষার মধ্য দিয়ে একজন নারীও সন্তানদলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যাঁকে সত্যানন্দের মত গুরু নিজহস্তে দীক্ষিত করেছেন এই উপন্যাসে। 'আনন্দমঠে' যে ধরনের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম দেখানো হয়েছে তা কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নয়, বর্তমান যুগেও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু দেশমাতার প্রতি যে অবিচল শ্রদ্ধা ও ভক্তি, এবং ভারতমাতার দুর্দশার প্রতি মানুষকে সচেতন করার যে প্রচেষ্টা তিনি করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চ-নিচ-এই জাতিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে দেশকে 'মা' রূপে পূজা করার মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করাই হল একজন ভারতীয়র প্রকৃত কর্তব্য।

Reference:

(১) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম। (১৩৩২)। আনন্দমঠ, বরদা এজেন্সি, পৃষ্ঠা- ২৭

(২) সরকার, যদুনাথ। (১৩৪৫)। আনন্দমঠ, বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংকলন, বঙ্কিম সাহিত্য পরিষৎ, ভূমিকা অংশ

(৩) পূর্বোক্ত, আনন্দমঠ, বরদা এজেন্সি, পৃষ্ঠা- ৪৬

(৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪

(৫) চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র। (১৮৯৩)। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, মুখার্জী বোস এন্ড কোং, পৃষ্ঠা- ৫২

(৬) পূর্বোক্ত, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, বন্দে মাতরম, পৃষ্ঠা- ২৮৭

(৭) পূর্বোক্ত, আনন্দমঠ, বরদা এজেন্সি, পৃষ্ঠা- ১০৪

(৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০৫

(৯) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (১৩৪৮)। ধর্ম্মতত্ত্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা- ৪৫-৪৬

(১০) পূর্বোক্ত, আনন্দমঠ, বরদা এজেন্সি, পৃষ্ঠা- ২০৫-২০৬

(১১) পূর্বোক্ত, ধর্ম্মতত্ত্ব, পৃষ্ঠা- ৮২

(১২) পূর্বোক্ত, আনন্দমঠ, বঙ্কিম-শতবার্ষিকী সংস্করণ, ভূমিকা অংশ

(১৩) পূর্বোক্ত, ধর্ম্মতত্ত্ব, পৃষ্ঠা- ১১২

(১৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৭

(১৫) পূর্বোক্ত, আনন্দমঠ, বরদা এজেন্সি, পৃষ্ঠা- ৩৬-৩৭

(১৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৭

Citation: **Ghosh. D. K.,** (2025) "বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক চেতনায় 'আনন্দমঠ'", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-11, November-2025.